এই পথ চলা

শুজা রশীদ

আমেরিকাঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে - ১

১৯৯৭ সাল। আগস্টের মাঝামাঝি। তখন পর্যন্ত সব কিছু বেশ ভালোই যাচ্ছিল। H1B তে বিদেশী কন্সাল্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করি আমেরিকাতে। তখন ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্ট আমার ক্লায়েন্ট। তাদের হেডকোয়ার্টার ম্যাসাচুসেটসের মার্লবোরো নামে একটা ছোট শহরে। এটা বোস্টন থেকে প্রায় বিশ মাইলের মত দূরে। তখনও ব্যাচেলর এবং অন্যান্য ব্যাচেলর ভারতীয়দের সাথে খুব একটা উড়ু উড়ু জীবন যাপন করছিলাম। টাকা পয়সা যে খুব একটা ভালো পাচ্ছিলাম তা নয়। যে কন্সাল্টিং কম্পানির হয়ে কাজ করছিলাম তারাই আয়ের সিংহ ভাগ রেখে দিচ্ছিল। কেউ কোন আপত্তি করি না কারণ ইচ্ছা তাদের মারফতে গ্রীণ কার্ডের জন্য আবেদন করব। একবার কার্ড পেয়ে গেলে আর ওদের ধার কে ধারবে। সব হতে হতে বছর তিন চার লেগে যায়। কটা বছর একটু চোখ কান বুজে কাটিয়ে দেয়া।

মার্লবোরো ডাউনটাউন

তারপর একদিন একটা ঝামেলা হল কাজে। এক শ্বেতাঙ্গ কর্মীর উগ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় সে তার প্রভাব খাটিয়ে আমার মহিলা ম্যানাজেরকে বাধ্য করল আমার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করতে। আমাকে দুই সপ্তাহের নোটিশ দেয়া হল। ম্যানেজারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো

ছিল। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের কারণটা আমি ঠিক ধরতে পারি নি। খুব সম্ভবত তার উপরের কারো কাছ থেকে চাপ এসে থাকবে।

যাইহোক, আমার কন্সাল্টিং কম্পানীকে আমি সব খুলে বললাম। মালিক ভারতীয়। মানুষ মন্দ নয়। তার হাতে তখন দুটি নতুন কন্ট্রাক্ট আছে। একটি স্থানীয় এক I .T. কম্পানিতে, অন্যটি আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে, স্পোকেনে, একটি বিদ্যুত কম্পানীতে। স্পোকেন ওয়াশিংটন স্টেটের একটি বড় শহর। পশ্চিম তীরের পরিচিত শহর সিয়াটল থেকে শ' তিনেক মাইল পূর্বে। প্রায় দুই লাখ মানুষের বাস। সিদ্ধান্ত নিতে মুহূর্তের বেশী লাগে না। একটা পরিবর্তন চাইছিলাম। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন করে অন্য কোথাও ঘর বাঁধতে চাইছিলাম। তাছাড়া একা মানুষ, ঘুরে বেড়ানোর এটাইতো সুযোগ।

আমার নতুন কাজ শুরু হবে এক সপ্তাহ পর। লং ড্রাইভ করতে সব সময়ই পছন্দ করি। এইরকম একটা সুযোগ হেলায় হারাতে মন চাইল না। ফ্লাই করে গেলে ঝট করে চলে যাওয়া যাবে, ঘন্টা ছয়েকের পথ, কিন্তু কিছুই তো দেখা হবে না। ম্যাপ বের করে একটু হিসাব কিতাব করলাম। বোস্টন থেকে স্পোকেন তিন হাজার মাইলের মত দূরত্ব। চারদিকে পাহাড় ঘেরা শহর। ওয়াশিংটন এবং আইডাহোর জাংশনে অবস্থিত শহর, অরেগন এবং কানাডা থেকে খুব দূরে নয়। আমার কম্পানীকে জানালাম ফ্লাই করে না গিয়ে আমি ড্রাইভ করে যাবো। আমার সেখানে যাবার খরচাদি তাদেরকে তো দিতেই হত। আমি ড্রাইভ করে গেলে খরচ বেশী হবার কোন কারণ নেই। তারা আমার যাবার সমস্ত খরচ – তেল, থাকা এবং খাওয়া – বহন করতে সম্মত হল। এবার আমি আমেরিকার ম্যাপ, ট্যুর বই ইত্যাদি নিয়ে বসে গেলাম প্ল্যান করতে। অচেনা পথ, আগে থেকে হোটেল/মোটেল ঠিক করে রাখাই ভালো। বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল। সবাই বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে। দেখা যাবে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। বিরাট ঝামেলায় পড়ে যাব। ম্যাপ দেখে প্রতিদিন কতখানি পথ যাবো তার একটা খসড়া হিসাব করলাম। ইচ্ছা পথে আকর্ষনীয় স্থানগুলো দেখতে দেখতে যাবো। সুতরাং এমনভাবে প্ল্যান করলাম যেন প্রতিদিন অর্ধেক দিন ড্রাইভ করব এবং বাকী অর্ধেক দিন যেখানে নোঙর ফেলব সেখানটা ঘুরে ঘুরে দেখব।

জিনিষপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। খাটও কখন কিনিনি। কাজের জন্য কখন কোথায় যেতে হয়। খাট-ফাট নিয়ে খামাখা ঝামেলা। মেঝেতে তোষক পেতেই আরামসে ঘুম দিতাম। কয়েকটা হাঁড়ি পাতিল অবশ্য ছিলাম। রান্না বান্নায় হাত ছিল জঘন্য কিন্তু বাইরের খাবার রোজ খাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনিতেই হাই ক্যালোরি খাবার খেয়ে খেয়ে শরীরের চেকনাই বেড়ে গেছে। দেশ থেকে বছর পাঁচেক আগে যখন বেরিয়েছিলাম তখন ছিলাম মাত্র ১২৫ পাউন্ড। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশূনার সময় দক্ষিণ ভারতীয় এক বয়েসী পি.এইচ.ডি স্টুডেন্ট আমার রুমমেট ছিল। তার নাম ছিল পিলাকা ভি মুর্তি, আমাদের সবার মুর্তি দা। তিনি ভয়ানক পরোটা বানাতে এবং আলু ভাজি করতে পারতেন। হররোজ তার হাতের খাবার খেয়ে খেয়ে কোরবাণির গরুর মত ফুলে গিয়েছিলাম। পড়া শেষ করে কাজ নিয়ে তার কাছ থেকে দূরে চলে আসার পর আবার একটু একটু করে চেকনাই কমছে। যাইহোক, হাঁড়ি পাতিল ছাড়াও আমার লেপ, তোষক, বালিশ, জামা-কাপড়, কম্পিউটার

জাতীয় জিনিষপত্র সব মিলিয়ে একেবারে নগন্য ছিল না। সব গোছগাছ করতে কয়েক ঘন্টা গেল।

নতুন কাজের যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনও আগের কাজ চলছে। দুই সপ্তাহের নোটিশ তখনও শেষ হয় নি। ঠিক শেষ হবার আগের দিন ম্যানেজার আমাকে ডেকে আরোও কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করল। আমি সরাসরি তাকে জানিয়ে দিলাম আমার জন্য নতুন একটি কাজ ইতিমধ্যেই রেডী হয়ে আছে। এখন আর পিছিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। মনে মনে খুব আনন্দ পেলাম। কোন অপরাধ ছাড়াই যখন কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে দিয়েছিলে তখন তোমার মাথায় কি চিন্তা চলছিল। জানি, সে বাধ্য হয়ে চাপের মুখে পড়েই করেছিল কিন্তু একজন ম্যানেজার হিসাবে তার আরোও মনের জোর থাকা উচিৎ। যাইহোক, পরদিন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি শেষবারের মত ফিডেলিটির প্রাঙ্গন ত্যাগ করি। ভবিষ্যতে আর কখনও সেখানে কাজ করা হয় নি।

পরদিন সকালে গাড়ীতে এক এক করে সব জিনিষপত্র তুললাম। দেখা গেল যতখানি অল্প জিনিষ ভেবেছিলাম ততখানি অল্প নয়। আমার ১৯৯৬ মডেলের টয়োটা করল্লা বিশাল গাড়ি ছিল তা নয় কিন্তু ধবধবে সাদা রঙে তাকে একটা বলাকার মত লাগত। আমি আদর করে আমার প্রথম উপন্যাস নীলির সাথে মিলিয়ে তার নাম দিয়েছিলাম *নীলি*। আমার দুই রুমমেটের সাথে গলা মিলিয়ে, তাদেরকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ির ট্রাংক সহ ভেতরে জিনিষপত্রে একেবারে কানায় কানায় পূর্ন, একমাত্র ড্রাইভারের সিটটাই ফাঁকা। আমার মনের মধ্যে খুব আবাগের আলোড়ন চলছে। বেশ লম্বা লম্বা ড্রাইভিং ইতিমধ্যেই করেছি কিন্তু এতো লম্বা নয়। ভীষন উত্তেজনা এবং আনন্দ দুটোই একসাথে অনুভব করছি। শেষবারের মত দাঁড়িয়ে থাকা ধীরেন এবং শচীনকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। তিন হাজার মাইল। দিন পাঁচেকের যাত্রা। অনেক কিছু দেখা হবে। কোন বিপদ আপদ না হলেই হয়।

আমার পরিকল্পিত রুট

যাত্রা শুরু করবার কয়েক দিন আগেই বিস্তারিত রুট প্ল্যান করে রেখেছিলাম। প্ল্যান খুব সাদা মাটা । নিউ জার্সি পর্যন্ত ড্রাইভ করে ফ্রিওয়ে ৮০ নেব। সোজা ড্রাইভ করতে থাকলে ওহাইওর কোথাও গিয়ে এক্সপ্রেসওয়ে ৯০ পাওয়া যাবে। এটা ধরে সোজা চলতে

থাকলেই হবে কারণ ৯০ আমেরিকার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম পর্যন্ত চলে গেছে। পথে অবশ্য পথে একটা ব্যাতিক্রম করার কথা। মিনেসোটার রাজধানী মিনিয়াপোলিসে একটু ঘুরে যেতে হবে। সেখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে একটি মেয়ের সাথে দেখা করে যাবার হুকুম এসেছে বাংলাদেশ থেকে। বাবা-মা দু জনারই খুব আগ্রহ। সেই যখন ঐ পথে যাচ্ছিস, একটু দেখাটা করেই যা। রাজী হয়ে গেছি। কোথায় কার ভাগ্য বাঁধা কে বলতে পারে?

প্রথম দিনে আমি খুব বেশী একটা ড্রাইভ করলাম না। অনেক দিন লম্বা ড্রাইভের অভ্যাস নেই। হঠাৎ করে বেশী চাপ নিয়ে শেষে একটা বিপদ আপদ না হয়। বিশেষ করে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ার একটা সম্ভাবনা তো থাকেই। মাত্র ৩৫০ মাইল গিয়ে পেন্সিলভানিয়ার ব্লুমসবার্গে থামলাম সেদিনের জন্য।

অমিশ ল্যান্ড

রাত হতে অনেক বাকী। হাতে ঘোরা ফেরা করার যথেষ্ট সময়। পেন্সিলভানিয়ার বিখ্যাত অমিশ ল্যান্ড না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টি, যেখানে তাদের প্রধান আবাস সেটা মাত্র নব্বই মাইল দূরে। ঘন্টা দেড়েকের বেশী লাগার কথা নয়। গাড়ী ছুটিয়ে চলে গেলাম। অমিশরা জাতীতে ডাচ। আধুনিকতা থেকে যতখানি দূরে থাকা সম্ভব ততখানি দূরত্ব তৈরী করে জীবন যাপন করে তারা। সব কিছু এখনও আগের নিয়মেই চলে তাদের জগতে। ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদেরকে শহরে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। বেশ একটা অভিনব অভিজ্ঞতা।

পরদিনই আমার মিনিয়াপলিসের ইউনিভার্সিটিতে যাবার কথা। ব্লুমসবার্গ থেকে অনেক পথ, প্রায় ১২০০ মাইল। একদিনে ড্রাইভ করার জন্য অনেক লম্বা পথ। অনেকক্ষন ড্রাইভ করতে হবে। মোটেলে ফিরে গিয়ে কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে বিছান্য চলে গেলাম। ভালো ঘুম না হলে পরদিন এতো পথ যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। গড়ে ৮০ মাইলে গেলেও প্রায় ১৫ ঘন্টার ড্রাইভ।